গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

বহু প্রতীক্ষিত রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল অযোধ্যা নগরীতে। ভগবান রাম শুধু হিন্দু ধর্মের উপাস্য নন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইন্দোনেশিয়াতেও ভগবান রামের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। ঐ দেশের মুসলমান ভাইবোনেরাও রামায়ণকে ('কাকনিক' নামে) একটি পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে দেখেন। থাই সংস্কৃতিতেও, ভগবান রাম বৌদ্ধ ধর্মের সাথে গভীরভাবে জড়িত। ভারতের মুসলিম ভাইবোনেরাও ভেট অর্পণ করেছেন রামলালার পাদপদ্মে। শ্রীরামের আশীর্বাদে ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বন্ধন চিরতরে অক্ষুণ্ণ থাকুক...

ত্রৈমাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৫, সংখ্যা ১

জানুয়ারি ২০২৪

সা
ধা
র
ণ

সং
খ্যা

কলম হাতে

ডঃ মালা মুখার্জী, শীলা সরকার, শুভা মুখার্জি, শুভ্র নাগ, রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

বিগত এক বছর কিছু অনিবার্য কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের সকলের প্রিয় 'গুঞ্জন' মাসিক ই-পত্রিকা বন্ধ রাখতে হয়েছে। তার জন্য 'গুঞ্জন' কর্তৃপক্ষ দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। তবে 'গুঞ্জন'-এর দৌড় বিলুপ্ত হয়ে গেছে ভাবলে ভুল হবে। চলতি বছরে নতুন উদ্যমে 'গুঞ্জন'-এর পথ চলা আবার শুরু হল। এটা ঠিক যে, নতুন বছরে 'গুঞ্জন'-এ কিছু বদল ঘটানো হয়েছে, কিন্তু এ পরিবর্তন লেখক ও লেখিকাদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই করা হয়েছে। 'গুঞ্জন' আগে মাসিক ই-পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হত। কিন্তু এখন থেকে 'গুঞ্জন' ত্রৈমাসিক ই-পত্রিকা আকারে প্রকাশিত হবে। আশা করি, এই নতুন উদ্যম পাঠকমহলে গ্রহণীয় এবং আদৃত হবে।

এ বছর আরও নতুন নতুন বিভাগ শুরু করা হবে। তাই নতুন ও পুরাতন সকল লেখক ও লেখিকাদের 'গুঞ্জন'-এর পাতায় কলম ধরার একান্ত আহ্বান রইল। শুরুর থেকেই আপনাদের আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতা 'গুঞ্জন'-কে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আর ভবিষ্যতেও তা অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই প্রত্যাশাই আমাদের আগামী দিনের পাথেয়। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন
বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

নতুন বই

প্রাপ্তিস্থলঃ জাগরী পাবলিকেশন প্রা. লি.
কলেজ স্ট্রিট ইষ্ট, ব্লক ৪, কলকাতা ৭০০০৭৩
দূরভাষঃ +৯১ ৮০০১১ ৩২৮০৯

কলম হাতে

আমাদের কথা – পায়ে পায়ে পৃষ্ঠা ০২

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

হাসির কবিতা – পদ্য লেখার প্রাপ্তি পৃষ্ঠা ০৫

শুভা মুখার্জি

প্রবন্ধ – অথ পৌষ সংক্রান্তি কথা পৃষ্ঠা ০৭

শুভ্র নাগ

কবিতা – সেতু পৃষ্ঠা ১৬

শীলা সরকার

বড় গল্প – সেদিন সন্ধিক্ষণে পৃষ্ঠা ১৯

ডঃ মালা মুখার্জী

কবিতা – স্রোত পৃষ্ঠা ৪৯

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

গল্প – দৃষ্টান্ত পৃষ্ঠা ৫১

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

পদ্য লেখার প্রাপ্তি

শুভা মুখার্জি

কবি হবার স্বপ্ন নিয়ে
লিখতে বসি খাতায়,
নাতনী এসে হঠাৎ করে
আঁচড় দিল পাতায়।

কি করি যে, ভাবছি বসে তাই...
ঠিক করলাম, ওকেই ভোলাই।
বললাম, তুই আঁকতে পারিস
আমার ছবিটাই।

আঁকতে বসে আঁকল সে
ছোট্ট ইঁদুরছানা।
পিঁপড়ের মতো পা দু'টো তার
পিঠের ওপর ডানা...

ছড়ার গুরু সুকুমার রায়
পাশে থাকলে আজ,
নামটি দিতেন অনায়াসে
যাতে থাকত নাজ।

‘পিঁপদুর’ পাখি নামটা দিলাম,
অনেক ভেবে, বিশাল ঘেমে...
তাইনা শুনে নাতনী আমার
কপালটাকে দিল ক’বার চুমে। ■

অথ পৌষ সংক্রান্তি কথা

শুভ্র নাগ

আজ সংক্রান্তি - আজ আমার বিদায় নেবার দিন - যতই তোমরা আমাকে ভালবাসো - যতই ছেড়ে না যেতে বলো তবু সময়ের নিয়মে একদিন তো যেতে হবেই - তাই চললাম। যাবার সময় তোমাদের জন্য রেখে গেলাম সোনালী ভালোবাসা- আমার রেখে যাওয়া ভালোবাসায় তোমাদের ভাণ্ডার হোক পূর্ণ - প্রাচুর্যমন্ডিত।

আজ এক পুণ্যদিন - দেবাসুরের যুদ্ধশেষে শুভশক্তির প্রকাশ হয়েছিল। আজ অসুরদের ছিন্ন মস্তক ভগবান বিষ্ণু প্রোথিত করেছিলেন মন্দিরা পর্বতে - বিনাশ হয়েছিল অশুভ শক্তির আস্ফালন।

আজ আবার সূর্যদেব যাত্রা শুরু করেছেন দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণের পথে - তিনি আজ প্রবেশ করছেন তাঁর পুত্র মকর রাশি অধিপতি শনিদেবের গৃহে। দেবগণও আজ দীর্ঘ নিদ্রা শেষে জাগ্রত হয়েছেন শুভশক্তির বিকাশ আসন্ন।

আজ এক পুণ্যদিন - মহাভারতের যুগে আজকের দিনে মহামতি ভীষ্ম তাঁর পার্থিব দেহ ত্যাগ করে যাত্রা করেছিলেন স্বর্গের পথে। আবার আজকের দিনে কোনো এক যুগে

ইক্ষ্বাকু রাজবংশের সগররাজের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ভগীরথ পতিতপাবনী মা গঙ্গাকে স্বর্গ হতে নিয়ে এসেছিলেন পৃথিবীতে কপিল মুনির আশ্রমে। তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষের ষাট হাজার মানুষকে উদ্ধার করার জন্য যাঁরা এক সময় কপিল মুনির তেজ সহ্য করতে না পেরে ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

আজ মকর রাশিতে সূর্যদেবের প্রবেশের দিনটি স্মরণীয় করতেই বুঝি তোমরা আজকের দিনটির নাম দিয়েছ 'মকর সংক্রান্তি!' আজ ভোর থেকে গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রম সমুখে চলছে সাধু-সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের স্নান। মা গঙ্গা মর্ত্যধামে এসে যে সাগরে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন সেই জায়গাই তো গঙ্গাসাগর - পবিত্র তীর্থস্থান - তাইতো "সব তীর্থ বারবার / গঙ্গাসাগর একবার।" তাইতো এ পুণ্যস্নানের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে আসছে আবহমান কাল থেকে - এবারও তার অন্যথা হয়নি। যাঁরা যেতে পারেননি তাঁরা আজ কেউ প্রয়াগ সঙ্গমে, কেউ বা অন্যান্য নদীতে বা জলাশয়ে স্নান করে বলছেন – "মকরেতে যে বা স্নান করে / শতেক যোজন থেকে যদি গঙ্গা বলে ডাকে / পবিত্র তাহার কলেবর।" যুগ যুগ থেকে আজও পুণ্যলোভাতুর মানুষের পুণ্য লাভের কি প্রাণপণ প্রচেষ্টা।

শুধু কি তাই? এদেশে বিদেশে আজ এই দিনে কত উৎসব - কোথাও বিহু, কোথাও লোহরি, কোথাও বা পোঙ্গল, খিচুড়ি, ঘুঘুটি, দহি চুরা, সোংক্রান, থিংয়ান- কত

নাম - কত রূপ তার। কোথাও ওড়ে ঘুড়ি, কোথাও বা নৃত্য-গীত, কোথাও বা তিলগুড়।

এদিকে বাংলার মাটিতে তোমরা আমাকে কখনও বুড়ি বলে ডাকো - কখনও বা লক্ষ্মী। আর তাই তো আমি তোমাদের সারা মাঠ ভরিয়ে দিয়েছি সোনালী ফসলে - দেখো দেখো দিগন্ত বিস্তৃত হলুদ রং - না বিবর্ণ হলুদ নয় - কাঁচা হলুদ - পাকা ফসল। তোমাদের ডাক দিয়েছি এই হলুদ মাঠে, কুয়াশা ভরা মায়াময় স্নিগ্ধ শিশিরসিক্ত সকালে, দুপুরের নরম কবোষ্ণ রোদে, অপরাহ্নবেলার বিষণ্ণতায়, নক্ষত্রখচিত সন্ধ্যায় আর মেঘমুক্ত নিশীথে, উত্তরের শীতলতায়। তোমাদের কবি আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাই আমার ডাক পৌঁছে দিয়েছেন তোমাদের কাছে - "... আয় রে চলে আয় আয় আয় / ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে / মরি হায় হায় হায়।"

শীত মায়ের দুই মেয়ে আমরা, আজ যাবার বেলায় আমি সাজিয়ে দিয়ে যাই তোমাদের ডালা - পূর্ণ করে দিয়ে যাই - ঝরিয়ে দিয়ে যাই জীর্ণ পাতা যত - বসন্তের আগমনীর মুখরা গেয়ে গেলাম আজ, আর অন্তরার ভার দিয়ে গেলাম আমার সহোদরার হাতে।

আজ পৌষ সংক্রান্তি - দেখো দেখো ওদিকে ভোরবেলায় চতুর্দোলায় টুসুদেবীকে নিয়ে গান গাইতে গাইতে গ্রামের মেয়ে-বৌ-রা টুসু বিসর্জনে যাচ্ছে। এদিকে

তোমরা আমাকে ধরে রাখতে আগলে রাখতে ছড়া কাটছো। “এসো পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না...।” বলছো – “পৌষমাস লক্ষ্মীমাস যাইও না ছাড়িয়ে / ছেলেপিলেকে ভাত দেব থালা ভরিয়ে।”

আমার ভালো লাগে তোমাদের এই আকুলতা দেখে। দেখছি পৌষ আগলানোর পালা করছো তোমরা তোমাদের ঠাকুর ঘর থেকে সদর দরজা পর্যন্ত জল ছিটিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে। আমাকে নিয়ে আজ তোমাদের পৌষপার্বন - এই পার্বনের নরম প্রদীপ শিখার আলোটিকে আজকের আধুনিকতার আলোতে যতই ম্লান মনে হোক না কেন - আমি জানি এই প্রদীপ শিখাটি কিন্তু এখনও আপন মহিমায় উজ্জ্বল। তাইতো এখনও তুলসীতলায় প্রতি সন্ধ্যায় যে গৃহলক্ষ্মীটি প্রদীপ দেয়, যে গৃহলক্ষ্মীর শঙ্খধ্বনিতে আমন্ত্রিত হয় সন্ধ্যা - তার গৃহে আজ ফি বছরের মতো এ বছরও আয়োজিত হচ্ছে আন্তরিকতায় মাখা পৌষপার্বন।

আমি তো নতুন ধান এনে দিয়েছি তোমাদের - তা দিয়ে সাজিয়ে নিও তোমাদের গৃহের অঙ্গন-প্রাঙ্গণ তুলসী মন্দিরে এঁকো ‘নেড়া নেড়ি’র ছবি আর যদি তোমার ঘরে ঢেঁকি থাকে তাকে পরিয়ে দিও সিঁদুর - শুভসিন্দুর - গাঁদা আর সরষে ফুল দিয়ে তৈরি কোরো পৌষ বুড়ি আর মাটির উনুনে দিও সুন্দর আলপনা। এরই মধ্যে হয়তো কাল রাতে নতুন ধান থাকা খড়কে বিনুনির মত বেঁধে তাতে আমপাতা,

সরষে ফুল আর মূলো ফুল লাগিয়ে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় বেঁধেছ পৌষলক্ষ্মীকে আগলেছ আমাকে - সেই সঙ্গে বলেছ – "আওনি-বাওনি চাউনি / কোথাও না যেও, তিন দিন ঘরে বসে পিঠেপুলি খেও / খাল পার না হয়ো / গাঙ পার না হয়ো / ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকো।" আমি লক্ষ্মী – 'আওনি' মানে আমার আগমন চেয়েছ – 'বাওনি' মানে আমাকে বাঁধতে চেয়েছ। আর 'চাউনি' মানে আমার কাছে প্রার্থনা করেছো। তোমাদের বিশিষ্ট ভাষাবিদ কামিনী কুমার রায় তো আমার সঠিক রূপটিকে এভাবেই তুলে ধরেছেন তোমাদের কাছে। এরপর আমি কি তোমাদের ছেড়ে যেতে পারি?

বড় ভালো লাগছে আমার কি অপরিসীম শ্রদ্ধায়, কি মধুর ভালবাসায় তোমরা নতুন চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করছো কত রকম পিঠে হরেক তার নাম, হরেক তার স্বাদ। এই পৌষে খেজুর গাছ অকৃপণভাবে দিয়েছে তার সুমিষ্ট রস- তা দিয়ে তোমরা তৈরি করেছো নলেন গুড় - সে দিয়ে আজ তৈরি করছো পায়েসামৃত। আর তা সযত্নে তুলে দিয়েছ আত্মীয়-স্বজন-পরিজনদের পাতে তাদের তৃপ্তিতেই তো তোমাদের তৃপ্তি।

বড় ভালো লাগছে গ্রামবাংলার চালচিত্রের এই সুন্দর ছবিখানি - বাঙালির সংস্কৃতিতে আষ্টেপিষ্টে আমি জড়িয়ে আছি এভাবেই তোমাদের সঙ্গে।

আজ এই সংস্কৃতিকে তোমরা অনেকে নিয়ে এসেছ আধুনিকতার পণ্যবাজারে - বিকিকিনির হাটে - কত বিজ্ঞাপন - কত প্রাণহীন মেকি পৌষ উৎসবের আয়োজন কত জায়গায়। বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থায় এটা তো হবার ছিল। তাই হচ্ছে আগামী দিনে আরও হবে। এটাই তো বাস্তব।

তবু এখনও কোনো গ্রামের বা শহরের কোনও বাড়িতে এই লোকাচারে অনেকেই আমাকে নিয়ে মেতে ওঠে প্রাণের উষ্ণতা দিয়ে। আমি দেখতে পাচ্ছি গ্রাম-শহরের কোনো এক বধূ তাদের নিজ সংসারের মঙ্গল কামনায় কি পরম ভালোবাসায় পৌষকে আগলে রাখছে। দেখতে পাচ্ছি গ্রাম ও শহরের কোনো কোনো গৃহলক্ষ্মী এভাবেই নিজ নিজ সংসারের শুভ কামনায় আমাকে বলছে- "পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস / যাইও না ছাড়িয়ে ..."

তবু যেতে তো হবেই - এটাই তো কালের নিয়ম। তবে তোমাদের আশীর্বাদ করে যাই যে তোমাদের সংসার পূর্ণ থাকবে কানায় কানায়। আমার দৃষ্টি সর্বক্ষণ থাকবে তোমাদের ওপর। আমি তো শুধু পৌষ নই, আমি তো দেবী লক্ষ্মী, ভরসা রেখো আমার ওপর- এ যে আমার প্রতিশ্রুতি। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হলো।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হলো।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক** এখানে দেওয়া হলো।

সেতু

শীলা সরকার

সেতুর এপার থেকে শুধু হাঁটছি আর হাঁটছি...
কবে কখন কোথায় শেষ হবে তা অজানা।
এই সুন্দর মনোরম সেতুটি কি মজবুত,
নাকি নড়বড়ে তক্তপোসের উপর সাজানো...
ভাবতে ভাবতেই উদয়াস্ত পেরিয়ে যায়।

তবুও জীবনের অদৃশ্য সেতু পেরোতেই হয়।
যদি মাঝপথে অজান্তে ভেঙে পড়ে সেই সেতু...
তখন স্মৃতির সেতুই গড়তে শেখায় আবার...
থামতে চায়না কেউ, মানতে নারাজ পরাজয়...
জলে ভিজে রোদে পুড়ে ভাঙে কঠিন পাহাড়।

বিশ্বাসের সেতুতে তাই হাঁটছি আবার শেষে।
নিশ্চয়ই সেতুর ওপারে তুই আছিস বসে একা,
তোর কাছে জমানো আছে মনের গোপন কথা।
অবশ্য তুইও তা জানিস এবং আমিও জানি,
তোর আর আমার মাঝে আছে স্মৃতির সেতু গাঁথা। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২২

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ialo

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eusb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tath

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zkwb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lnps

https://online.fliphtml5.com/osgiu/gqaz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/noyb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/oomz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eoat/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ubpb/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/rvpr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/fbyc/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'-এর ২০২২ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হলো।**

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ দিগন্ত...

শিল্পীঃ সঞ্জনা দাস ✧ বয়সঃ ১৬ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

সেদিন সন্ধিক্ষণে

ডঃ মালা মুখার্জী

রামবাগানের বড় বড় বাড়ীগুলোর ফাঁক দিয়ে যতটা নীল আকাশ দেখা যায় তাতে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভাসলেই তিনুর মনটা আনচান করে ওঠে। ওর জীবনেও মুক্তির স্বাদ হয়তো ওই একচিলতে আকাশটার মতো অতটুকুই। অবশ্য বাংলার মেয়েদের বরাতই অমন, তাও নাকি আজকাল ভদ্রঘরের মেয়েরা শাড়ী পরে বিনুনী দুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, কেউ কেউ বাড়ীতে মেমসাহেব রেখে ইংরাজি শিখছে, তবে সেসব আলো রামবাগান, বা সোনাগাছির মেয়েদের গায়ে লাগেনি। ওদের কাছে শিক্ষার আলো ঐ শরতের আকাশের সূর্যের মতো, এই রোদ, তো এই বৃষ্টি; নাহলে কয়েকমাস আগেও যে তিনুর জীবন আলোয় ঝলমলে ছিল, সে তিনুর জীবনে আজ এত অন্ধকার কেন? যদিও এই অন্ধকারের মূল কারণ ও নিজে, ওর মতো মেয়েদের জেদ থাকতে নেই, আত্মবিশ্বাসও নয়।

"তিনু, ও মা তিনু গেলি কই?"

মায়ের গলা শুনে তিনু তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়টা দড়িতে

মেলে, ভেজা চুলগুলোয় গামছা বেঁধে নীচে আসতেই ভক করে লক্ষ্ণৌ আতরের গন্ধ নাকে এলো। এইরকম ঝাঁঝালো গন্ধ ওর চেনা, বলা ভালো রামবাগানের সব মেয়েরই চেনা। কলকাতার বাবুদের বড় প্রিয় এই আতর...

তবে কি বীণা থিয়েটারের নীলমাধববাবু ডাকতে এলেন? অথবা, অন্য কোনো থিয়েটার গ্রুপ! কলকাতার নব্য বাবুদের মাথায় এখন সাহেবদের মতো থিয়েটারের ভূত চেপেছে, যারই পয়সা হচ্ছে সে থিয়েটারের দল গড়ছে, কখনো বীণা থিয়েটার, তো কখনো এমারেল্ড, আর সবার সেরা স্টার থিয়েটার তো আছেই, যদিও স্টারের সেই গৌরব এখন অস্তমিত, তবুও তিনু স্টার থিয়েটারকে ভুলতে পারলো কই? পুজো আসছে, আরও হয়তো কয়েকটা নতুন থিয়েটার গজিয়ে উঠলো!

তিনু বসার ঘরে পা দিয়েই থমকে গেল, দুজন অচেনা বাবু বসে, এদের সে কখনো দেখেনি। নতুন থিয়েটারপ্রেমী? হবেও বা! ও যে বীণা থিয়েটার ত্যাগ করেছে তা বুঝি জেনে গেছে! তবে, এদের চোখের চাউনি আলাদা, যেন বাঘ হরিণশাবক দেখছে!

"এই আমার মেয়ে," তিনুর মা পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "তিনকড়ি দাসী।"

"দেখেছি তো বীণা থিয়েটরে মীরাবাঈয়ের রোল করতে। খুব সুন্দর গানের গলা, নাচেও বেশ," একজন যুবক বলল।

"তাও তো ওস্তাদ রেখে নাচগান শেখাতে পারিনি, না হলে কোথায় লাগে বিনোদিনী, সুকুমারী আর প্রোমোদাসুন্দরী!" মা গদগদ হয়ে বললেন।

"পুরো দুশো করে দেবো মাসে মাসে; চাও তো এক বছরের অগ্রিমও দেবো," দ্বিতীয় বাবুটি আঙুলের রত্নখচিত আংটি নাচিয়ে বললেন, "তবে হ্যাঁ, ওসব থিয়েটার করা ছাড়তে হবে।"

"সে তো বটেই, নাহলে আমার বন্ধুটি এসে দেখবে তোমার মেয়ে থিয়েটরে 'অ্যাক্টো' করে বেড়াচ্ছে, তা তো হবে না! আর এসবের দরকারই বা কী? ও কার বাগান-বাড়ীতে যাচ্ছে দেখো!" বাবুর উমেদার বন্ধুটি বলে উঠলো।

তিনকড়ির মা রূপোর পিকদানিতে পিক ফেলে কিছু বলবার আগেই তিনু বলে ওঠে, "থেটার আমি ছাড়বো নে, বাবু।"

"কী!" বাবুরা হতবাক।

"থেটার ছাড়বিনে মানে? তোকে ছাড়তেই হবে," তিনকড়ির মা ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন।

"থেটার আমি ছাড়বো নে। আমি নটরাজকে শপথ করে থেটার জীবন শুরু করেছি, গিরীশবাবুকে গুরু মেনেছি। ও আমি ছাড়বো নে..."

বাবুদের মধ্যে সবচেয়ে দামী ধুতি-পাঞ্জাবী পরা বাবুটি উঠে দাঁড়ালেন, কোঁচানো ধুতির কুঁচিটি হাতে নিয়ে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন, দ্বিতীয় বাবুটি চশমার ফাঁক দিয়ে বললেন, "বেবুশ্যের এত তেজ ভালো নয়, তোদের চোদ্দোগুষ্টির ভাগ্যি আজ যিনি এসেছিলেন..."

"এই চোদ্দোগুষ্টির মধ্যে আপনাদের বাপ-দাদারাও সামিল নেই তো!" তিনু বলে উঠলো, "না মানে, কলকাতার সব বাবুকেই এখানে পাওয়া যায় তো..." তিনুর কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা বিরাশি সিক্কার চড় গালে এসে পড়লো।

তিনু মাটিতে পড়ে গেল, নেহাতই মাটিতে গদি বিছানো তাই, নাহলে মাথায় চোট অবধারিত ছিলো। মা আরও দুটো চড় মারবেন বলে এগোতেই দ্বিতীয় বাবুটিও বন্ধুকে অনুসরণ করলেন।

এদেশের পুরুষদের নারীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভ্যাস নেই, তায় সে যদি কারো কুলকামিনী না হয়ে বারবণিতা হয়, তাহলে তো ‘না’ বলবার অধিকার একেবারেই নেই। তিনকড়ি জানে এবার বেদম প্রহার শুরু হবে। তিনু কোনো রকমে উঠে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল, মা চেঁচাচ্ছেন, “আজ কাকে ফেরালি জানিস? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি। উনি থেটার করবেন! থেটার করে বিনোদিনী দাসী হবেন! আজ সাতবচ্ছোর হলো কেউ বিনোদিনীর খবর রাখে না। আর, যদি থেটারই করবি তো বীণা থেটার ছাড়লি কেনে? আমি কী তোরে বসিয়ে খাওয়াবো?”

তিনকড়ি টেবিলে রাখা নটরাজ মূর্তিটা বুকে ধরে কাঁদতে লাগলো। বেশ তো ছিল ও স্টারে, কোথা থেকে গোপাললাল শীল বলে এক উঠতি বড়লোক স্টার থিয়েটরের বিডন স্ট্রিটের বাড়ীটা কিনে নিলো [1], আশেপাশের জমিও কিনে নিলো, গড়ে উঠলো এমারেল্ড থিয়েটার। তিনু তো ভেবেছিল স্টারের দলের সাথে ঢাকা চলে যাবে, যদি দেখা হয় গিরীশবাবুর সাথে! গিরীশবাবুর ‘রাবণবধ’ দেখেই তো থিয়েটারের শখ চেপেছিল, আর

[1] ১৮৯১ সালে গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটরের বিল্ডিং কিনে এমারেল্ড থিয়েটার বানান।

ছিল বিনোদিনীর অনবদ্য অভিনয়! কী যে হলো! তিনু যতদিনে বড়ো হয়ে স্টারে যাতায়াত শুরু করলো, বিনোদিনী ততদিনে স্বেচ্ছাবসরে, গিরীশবাবুও অন্য দলে! তবুও কুড়ি টাকা পারিশ্রমিকে মেয়েটা স্টেজ আঁকড়ে পড়েছিল। তার মধ্যে এলো এই ঝড়। সেদিনও মা নিষেধ করেছিলেন, ঢাকা যাওয়া চলবেনা।

আসলে এসব পল্লীর মায়েরা ভয় পান কন্যারত্নদের হাতছাড়া করতে, মায়ের পরে মেয়ে দেহোপসারিনী হয়... এভাবেই অন্ধকারপল্লীর জীবন টিঁকে থাকে। তবে গত দু'দশক হলো এই অন্ধকার পল্লীর মেয়েরা 'অ্যাক্টো' করতে যাচ্ছে, লেখাপড়া জানা বাবুদের বোলচাল শিখে শিল্পী হচ্ছে, অবশ্য এ নিয়েও কলকতার বাবুদের একাংশের ঘোর আপত্তি ছিল। সেসব আপত্তি হাওয়ায় উড়িয়েই ওরা নতুন করে বাঁচছে।

তিনু এমারেল্ড আর বীণা দুটো থিয়েটারই দেখলো, প্রথমে এত এত পারিশ্রমিকের কথা বলে দল ভাঙায়, তারপর, টিকিট বিক্রি হচ্ছে না বলে টাকার অঙ্ক কম করে দেয়। এবার নীলমাধববাবুও তাই বলেছিলেন, অর্ধেক পারিশ্রমিকে কাজ করলে করো, নয়তো পথ দেখো! অপমান না সয়ে তিনু পথ দেখেছে।

সন্ধ্যা নামছে, দূরের গৃহস্থবাড়ী থেকে শঙ্খধ্বনির আওয়াজ আসছে, তিনু একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে গাইতে লাগলো, *'নুপুর রুনুঝুনু নাচত কানহাইয়া / বাজত মৃদু মৃদু মোহন মুরলিয়া।'* এই গানটা মীরাবাঈ সেজে তিনকড়ি রোজ গায়, বড়ই প্রিয় এর সুর! তিনু কল্পনা করে নেয় ওইই মীরা, কানাই ওর গানে অলক্ষ্যে নেচে চলেছেন।

দরজার ওপাশ থেকে মায়ের কান্নার শব্দ আসছে, পুজোর আগে কত টাকার ক্ষতি হয়ে গেল! দুর্গাপুজো মানেই বাবুদের বাগানবাড়ী আর বজরাগুলো আমোদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে; এমনকি বিলেতের লালমুখো সাহেবগুলোও এই আমোদ-আহ্লাদ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারে না। মা নিজের মনে বকবক করছেন, "এই আমিই একদিন তোকে স্টারে পাঠিয়েছিলুম... ভুলে গেলি? আজ আমি তোর শত্তুর?"

'দুধ পিকে হরি মিলোতো বহুৎ বৎসবালা / মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা ।।'

হরির নামে গরল না খেলে কী আর শ্রীকৃষ্ণ মেলে? মীরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য হাসিমুখে বিষ খেয়েছিলেন, তিনু না হয় থেটারের জন্য গোটা সমাজের বিষটা খাবে...

একদিকে যখন তিনকড়ি থিয়েটার ছাড়া অন্য কোনো

পথেই রোজগার করবে না বলে দোর দিয়েছে, তখন, এমারেল্ড থিয়েটরের গ্রীনরুমে ঝড় উঠেছে। কিছুকাল আগে বীণা থিয়েটার বন্ধ হয়েছে, আজ বোধহয় এমারেল্ডের দিন আসন্ন। অথচ, কিছুকাল আগেই স্টার থিয়েটরের বাড়ীটা কিনে নিয়ে কত ঝাঁকজমক করে এমারেল্ডের উদ্বোধন হল, কতগুলো শো হাউজফুলও হলো, তাহলে?

"থিয়েটারগুলো মনে হয় এবার উঠেই যাবে, কী বলো হে নীলমাধব?" প্রোবোধবাবু চা খেতে খেতে গ্রীনরুমে বললেন।

"তা থিয়েটার মালিকদের যা মতিগতি, তাতে তো তাই মনে হচ্ছে। তাঁরা যদি ভেবে থাকেন যে থিয়েটারের লাভের টাকায় ফূর্তি করবেন, আর যাঁরা মঞ্চে উঠে পরিশ্রম করে দর্শক টানছেন, তাঁরা কম বেতনে কাজ করবেন তাহলে মুশকিল!" নীলমাধব চক্রবর্তী বললেন।

"তুমি কি তিনকড়িবালার কথা বলছো?" রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, রাম," নীলমাধব বললেন, "বীণায় হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি, যখন বীণা ডুবলো মহেন্দ্রলাল ওকে এমারেল্ডে ডেকেছিল দ্বিগুন টাকার অফার দিয়ে, কিন্তু কে

জানতো, দু'একটা কাজ হতে না হতেই গোপালবাবু থিয়েটারে ইন্টারেষ্ট হারাবেন!”

“বড়লোকদের অমনই খেয়াল,” প্রোবোধ বললেন, “কোথা সে গিরীশবাবু, কোথায় বা বিনোদিনী... সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।”

“রাম তো ঢাকার রঙ্গমঞ্চ কাঁপাচ্ছে হে, বড় বড় জমিদারবাড়ীতে আসর জমাচ্ছে,” রামবাবু বললেন।

“আমাকেও কালীকৃষ্ণ রায় তাঁর বাড়ীর পুজোর ক'টাদিনের জন্য বলছিলেন, ওই ‘বিবাহ বিভ্রাট’ পালাটা শুনতে চান। জানোই তো, বাংলার দর্শক দুটো জিনিস খায়, এক হলো ঘরোয়া কোঁদল, দ্বিতীয়টা হলো ধর্ম্মের কথা; তা কালীকৃষ্ণ নব্যবাবু, প্রথমটাতেই রুচি।” নীলমাধব বললেন।

“নতুন দল গড়বে নাকি হে? তা মন্দ বলোনি।” প্রোবোধবাবু বললেন, “খামখেয়ালি বড়লোকের কাজ নয় এসব, থিয়েটার হলো গিয়ে সাধনা। তা নাম কী রাখবে? এখন তো আবার অনেক দল!”

“ক্যালকাটা থিয়েটার কেমন হবে? চলবে?”

“দৌড়বে,” প্রোবোধ বললেন।

"তাহলে চলো তিনকড়িকে ফিরিয়ে আনা যাক, আর ও হ্যাঁ, জগত্তারিণীকেও খবর দিতে হবে। এই গল্পে বিলাসিনী কারফর্মার রোলটা করার জন্য একজন পাকা অভিনেত্রী দরকার।"

যে রাত্রে তিনকড়িকে তার মা খেতে না দিয়ে দোর বন্ধ করে রেখেছিলেন, সেই রাত্রেই নীলমাধব, রামরতন আর প্রোবোধবাবু তিনজনে মিলে নতুন থিয়েটার পত্তনের কথা ভাবলেন। ভাগ্য কখন কার প্রতি সুপ্রসন্ন হন কেউ জানে না। তিনদিন তিনরাত না খেয়েও তিনকড়ি গানের রেওয়াজ ছাড়েনি, মনের মধ্যে ক্ষীন আশা, পরীক্ষা শেষে নটরাজ তাকে ঠিক জয়ী করবেন।

তিনকড়ির মা সদরে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। পুজো আসছে, রামবাগানেও খুশীর ছোঁয়া মানুষ দিনমানেও এপাড়ায় আসছে মাটি নিতে, বেশ্যাদ্বারের মাটি ছাড়া নাকি মা দুর্গার মূর্তি হয় না। এখন কলকাতায় জাঁকজমকের পুজো অনেক, রাজা নবকৃষ্ণদেবের পুজো তো আছেই. এ ছাড়াও সাবর্ণ রায়চৌধুরী, ঠনঠনিয়ার লাহাবাড়ী, দত্তবাড়ী এমন কত বাবুর বাড়ীর পুজো! কে কতটা পয়সা ছড়াতে পারলো সে নিয়েই রেষারেষি! ওদের পাড়ার মেয়েরাও সেসব পুজোর জলসায় নাচতে যায়, তবে অনেক বাবুই আজকাল লক্ষৌ আর দিল্লীর মুসলমানি বাঈজী আনে,

সুরাপানের সাথে সাথে নাকি চা-পানও চলে। চা কেমন পানীয় তা তিনুর মা জানেন না, কতটা নেশা হয় কে জানে! আবার, একজন বাবু নাকি বিলেতের নদীর জল আনিয়ে কলাবৌ স্নান করিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে নাকি লাখটাকার গয়না পরানো প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়, সে গয়নাগুলো নাকি সব বিলেত থেকে আসে। তিনুর মা কখনো বিলেতি গয়না চোখে দেখেননি। ওদের কেউ পুজোয় ডাকে না। তবে মেয়ে যদি সেদিন হাতের লক্ষ্মী পায়ে না ঠেলতো তো তাহলে হয়তো আজ রাজরাণী হতো!

জুড়িগাড়ীর আওয়াজে তিনুর মা চোখ তুলে চাইলো। তিনজন বাবু এয়েচেন, তা অমন এখানে রোজ আসেন। তবে, এঁরা ওর ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছেন।

"তিনকড়িবালা দাসীর বাড়ী এটা?"

"সে মরেছে," তিনুর মা বলল।

"মরেছে মানে? এই তো তিনদিন আগে দেখলাম..."

"দড়ি-কলসী জোটেনি, তাই বিষ খেয়েছে," তিনুর মা বললেন।

নীলমাধব বাবু ধাক্কা খেলেন। তিনকড়ি কি সত্যি আত্মঘাতী

হলো? এই অন্ধকার পল্লীতে এমন ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে, নীলমাধববাবু চলে আসছিলেন হঠাৎ শুনলেন সেই গান, যা রাতের পর রাত থিয়েটারের মঞ্চ কাঁপিয়েছে, **‘নুপুর রুনুঝুনু নাচত কানহাইয়া/ বাজত মৃদু মৃদু মোহন মুরলিয়া।’**

“এ গান কে গাইছে? দোহাই আপনাকে, আমরা থিয়েটরের লোক, নতুন দল খুলেছি, পুজোতে অনেক বড় বায়না...”

তিনুর মা এবার চোখ মুছলেন, ভগবান বুঝি মুখ তুলে চাইলেন।

“আপনারা ভিতরে আসেন, আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, কী বলতে কী বলে ফেলেছি। আমি এখুনি তিনুকে ডেকে আনছি।” মাকে ডাকতে হয়নি, থেটারবাবুদের গলা পেয়ে তিনু নিজেই এসেছে।

“আমি রাজি, বাবু.” তিনুর হাতে নীলমাধববাবু চল্লিশটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, “প্রতি মাসে চল্লিশ দেবো, বীণায় যা পেতে তার দ্বিগুন। মনে রেখো, মহালয়া থেকেই রিহার্সাল শুরু, মানে কাল থেকে। ঠিক সময়ে গাড়ী এসে যাবে।”

তিনকড়ি টাকাটা নিয়ে কপালে ছোঁয়ালো, এ বায়না ওর

কাছে নটরাজের আশীর্ব্বাদ। তিনকড়ির মা মেয়ের চুলে গন্ধতেল দিলেন, চিরুনি চালালেন, তিনকড়ি তখন নাটকের স্ক্রিপ্ট দেখতে ব্যস্ত। ওর সঙ্গে মঞ্চে নামবে ডাকসাইটে অভিনেত্রী জগত্তারিণী, যে এক এক রোজে একশ টাকা নেয়। এই প্রথম থিয়েটারের মঞ্চের বদলে বনেদীবাড়ীর পুজোয় অভিনয় করা। কেমন হয় গেরস্থের ঘরে পুজো?

জুড়িগাড়ী হাঁকিয়ে রামবাগানের কোনো মেয়ে 'থেটারে অ্যাক্টো' করতে যাচ্ছে মানে বিশাল ব্যাপার। আশেপাশের বাড়ী থেকে উঁকিঝুঁকি শুরু, এখানকার মেয়েরা কেউ লজ্জাশীলা নয়, তাই মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকতে হয়না। তিনকড়িও গাড়ী হাঁকিয়ে চললেন কালীকৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে।

তিনমহলা বাড়ী গঙ্গার ওপর, বারমহলে থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে থিয়েটারের লোকজনের, এমনকী মেয়েদেরও। অন্দরমহল শুধুই কুলকামিনীদের জন্য, বারাঙ্গনাদের জন্য নয়। তবে কয়েকজন কুলশীলা বালিকা-কন্যাও খিড়কীর ফাঁক দিয়ে থিয়েটারের মেয়েমানুষদের দেখছে বইকী! এরা ঘোমটা দেয় না, 'বেলাউজ' পরে, পায়ে জুতোও পরে, কী অনাচার! তায় বেটাছেলেদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 'অ্যাক্টো' করে! থেটারের চেয়ে থেটারের মেয়েরাই দ্রষ্টব্য!

তিনকড়ির কাছে এত বড় বাড়ীর মত এর আসবাবপত্রও ভারী বিস্ময়ের! হলঘরে বেলোয়ারী ঝাড়বাতি, শয়নকক্ষে মেহগনির পালঙ্ক, দেওয়ালে বেলজিয়ান গ্লাসের আয়না, ফিনফিনে কাঁচের পেয়ালা-পিরিচ, পোর্সিলিনের ফুলদানী, চীনামাটির পুতুল, বাগানে মার্বেলের পরী আর ঝর্ণা, সবকিছুই বিদেশী, কিন্তু এরই মাঝে মা দুগ্গার মুখখানা যেন বাঙালী মায়েদের মুখের মতো ঢলঢলে। আজ শিল্পী চোখ এঁকেছেন, কপালে ত্রিনয়ন, মাঝে লাল গোল টিপ। সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর দিয়ে আর গোল সূর্যের মতো সিঁদুরের টিপে ওর নিজের মাকে কেমন লাগতো তা তিনকড়ির অজানা, কারণ, 'বেভুষ্যেরা' সিঁদুর-টিপ পরে না, নাহলে ওর মায়ের মুখখানাও... ছিঃ ছিঃ, এ কী ভেবে ফেলল ও!

'হে মা দুগ্গা, ক্ষমা করে দিও,' তিনকড়ি বলল।

"কিসের জন্য ক্ষমা চাইছো, মেয়ে?" এক স্নেহার্দ্র পুরুষকণ্ঠ বলে উঠলো।

তিনকড়ি তাঁর দিকে না তাকিয়েই বলল, "ভুল করে মা দুগ্গার জায়গায় নিজের মাকে বসিয়ে ফেলেছি। আমরা যে পতিতা..."

"আর জগন্মাতা হলেন পতিতদ্ধারিনী," লোকটি বললেন,

"মনে মনে স্মরণ করো, মুক্তো হবে।"

"তিনি যে মূর্তি, শোনেন কই?"

"তিনি চিন্ময়ীরূপে বাগবাজারে সশরীরে অবস্থান করছেন," লোকটি বললেন।

"আরে গিরীশ যে, কখন এলে," কালীবাবু দৌড়ে এলেন তাঁর বন্ধুকে আপ্যায়ন করতে। "ঢাকা থেকে কবে ফিরলে?"

"কালই ফিরলাম, ভাই, তোমার আমন্ত্রণ কি আর ফেলতে পারি? ওখানেও নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালির জমিদাররা আমার দলকে বুক করে রেখেছে, তা, কলকাতায় কে স্টেজ কাঁপাচ্ছে?" গিরীশ ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন।

"তুমি নেই কলকাতায়, আর কে মঞ্চ কাঁপাবে? পয়সা থাকলেই কী থিয়েটার হয়? এ হলো গিয়ে সাধনা," কালীবাবু বললেন।

তিনকড়ির বুকে দুরু দুরু হচ্ছে। ইনিই সেই গিরীশবাবু? 'রাবণবধ' পালার সময় এনারও বয়স অল্প ছিল, সম্ভবত তাঁর প্রথম অভিনয়। আজ তিনি অনেক পরিণত, তবুও সেই গিরীশবাবুই আছেন। এঁর দর্শন

পাওয়া মানে স্বয়ং নটরাজের দর্শন পাওয়া, এঁর বাণী মানে সাক্ষাৎ গুরুমন্ত্র। তিনকড়ি ভালো করে তাঁকে দেখবার আগেই দেখলো জগত্তারিণী, প্রোমোদাসুন্দরীরা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। তিনকড়ি নবাগতা, ছোটোখাটো রোল করে, এখানেও তাই, কেউ ওকে গিরীশ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করালো না।

দিনরাত এক করে রিহার্সাল শুরু হলো। স্বয়ং গিরীশ ঘোষ অষ্টমীর সন্ধ্যায় আবার আসবেন নাটক দেখতে। অমৃতলাল বসুর বিবাহ বিভ্রাট তাঁর প্রিয় প্রহসন। নীলমাধববাবু আদাজল খেয়ে নামলেন, পরিচালক হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করার এটাই সুযোগ। আজ অবধি গিরীশবাবুর হাত যার মাথায় উঠেছে, সে নাট্যজগতে দাঁড়িয়ে গেছে। হবে নাই বা কেন? তাঁর মাথার ওপরও যে স্বয়ং ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব আর মা সারদার হাত আছে...

"এটা এখনকার সামাজিক অবক্ষয়ের কাহিনী, স্যাটায়ার করে লেখা, মানে বিদ্রূপ করে দেখানো হয়েছে। গোপীবাবু কুলীন ব্রাহ্মণ, তাঁর মেয়ে কুমুদিনীকে বিবাহ দিতে চান ভালো ঘরে, কিন্তু সব নব্যযুবকের চাই লেখাপড়া জানা মেয়ে; কৌলীন্যের মাপকাঠি এখন বিএ, এমএ। কি বোঝা গেল? জগত্তারিণী তুমি হলে বিলাসিনী, ইংরেজি জানা বাঙালি ঘরের বউ... তুমি পারবে তো?" নীলমাধববাবু

কোনো প্লে মঞ্চস্থ করবার আগে সে বিষয়ে কুশীলবদের প্রেক্ষাপটটা বোঝান।

"হ্যাঁ, বাবু," জগত্তারিণী বললেন।

নীলমাধববাবু খুশী হয়ে বাকি রোলগুলো দিতে থাকেন। তিনকড়ি হলো কুমুদিনী, নায়িকা কিন্তু লজ্জাশীলা, ডায়লগ কম। রোল পাওয়া হয়ে গেলে স্ক্রিপ্ট, আজ সারা রাত পড়ে মুখস্থ করা, কাল থেকে রিহার্সাল।

রাত বাড়ছে, কুমোর কাজ শেষ করে ফেলেছে আজকের মতো। গতকাল মহালয়াতে দেবীকে চক্ষুদান হয়ে গেছে, আজ শাড়ী পরিয়েছে, অস্ত্র তৈরী করছে, এরপর চুল লাগাবে। দেবীর সব গয়না নাকি বিলেত থেকে এসেছে, মা নাকি মুকুটের বদলে টায়রা পড়বেন, ঠিক যেমন মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরেন। মূর্তিতে আজ সারাদিন ধরে ঘামতেল লাগানো হয়েছে, মায়ের সোনার বরণ অঙ্গ চকচক করছে। এমনই চকচকে কাঁসার বাসনে বারমহলে পাত পড়ছে। পুরুষ ভৃত্যরা পরিবেশন করছে, আর থিয়েটারের মেয়েদের সঙ্গে ঢলাঢলি। এই মেয়েদের সঙ্গে যা খুশী করা যায়...

ফুলকো ফুলকো লুচি পাতে পড়ছে, সঙ্গে বেগুন ভাজা আর ছোলার ডাল; শেষপাতে নবীন ময়রার মিষ্টি

আর পায়েস; রাতের খাবার জমে গেছে। নীলমাধববাবু বললেন, “এ বাড়ীতে রোজ শ’খানেক লোকের পাত পড়ে, আজ তো পাঁচশ’ ছাড়িয়েছে। ষষ্ঠী আর সপ্তমীতে দেখবে হাজার ছাড়াবে, এদের বাড়ীর সব মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী থেকে এলো বলে।”

তিনকড়ি জানে না শ্বশুরঘর কী, আর জানবেও না... তবে এ নিয়ে ওদের কারো মাথাব্যথা নেই। জগত্তারিণী, গোলাপসুন্দরীরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে, ওরা এই থিয়েটার জগতের প্রথমদিকের অভিনেত্রী, তিনুর মতো নবাগতাদের সঙ্গে ওঠেবসে না। তবে জগত্তারিণী যত বড় অভিনেত্রীই হোক না কেন বিলাসিনীর ভূমিকায় যেন মানাচ্ছে না, ইংরাজি উচ্চারণগুলোও যেন কেমন! অথচ, নাটকে বিলাসিনী মেমসাহেবদের কাছে ইংরাজি শিখেছেন। তিনকড়ি কথাটা বলবে বলবে ভেবেও বলতে পারেনি, নীলমাধববাবু কী ভাববেন?

দেখতে দেখতে দেবীর বোধন হয়ে গেল, সঙ্গে নবপত্রিকা স্নান; সকালে পুরোহিতের সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণে যেমন চারিদিক কেঁপে ওঠে, তেমনই রাত বাড়লে অযোধ্যর নর্তকীদের নুপুরের নিক্কন ধ্বনিতে। আজকাল এইসব নর্তকীদের পেতে লক্ষ্ণৌ ছুটতে হয় না, অযোধ্যার নবাব নিজেই মেটিয়াবুরুজে একটা ছোটোখাটো লক্ষ্ণৌ

নগরী বসিয়েছেন।

তাঁর আর পূর্বের অবস্থা না থাকায় নর্তকীরা বাইরেও মুজরো বসাচ্ছেন, বাঙালী সঙ্গীতরসিক আর ভোজনরসিকদের ঠিকানা মেটিয়াবুরুজ। মুজরো শেষ হলে থিয়েটার শুরু হবে। তবে, ‘বিবাহ বিভ্রাট’ যেন কাউকে আনন্দ দিতে পারছে না। অনেক অতিথিই ষষ্ঠীর শো দেখে আর সপ্তমীতে ভীড় বাড়াননি। এরকমভাবে চললে নীলমাধববাবুর নতুন থিয়েটারও চলবে না।

“আজ নাট্যগুরু আসবেন শো দেখতে, মনে আছে তো?” প্রোবোধবাবু বললেন।

“গুরুকে কী দেখাবো? মেয়েগুলো ইংরাজি বলতেই পারে না...”

“আমি পারবো, বাবু... বিলাসিনীর রোলখানা আমারে দেন,” তিনকড়ি সাহস করে বলল।

“তুমি সেদিনের মেয়ে হয়ে জগত্তারিণীকে টেক্কা দেবে?” প্রোবোধবাবু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন।

“দিয়েই দেখেন,” তিনকড়ি নাছোড়বান্দা।

“পার্ট মুখস্থ আছে?” নীলমাধববাবু জিজ্ঞেস করলেন, “এখন আর নতুন করে মুখস্থ করবার সময় নেই কিন্তু...”

তিনকড়ি সংলাপ বলতে লাগলো, কী সুন্দর ইংরাজি উচ্চারণ! অথচ, তিনি তো মেয়েটিকে শেখাননি। বিলাসনীর রোল তিনকড়িই করবে, কিন্তু জগত্তারিণী কি করবে? ওকে তো কম বয়সী নায়িকার ভূমিকায় মানাবে না! অবশ্য নীলমাধববাবুকে জগত্তারিণীকে নিয়ে বেশী ভাবতে হলো না, সে নবাগতা নায়িকার কাছে পার্ট হারিয়ে রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেছে।

প্রোবোধবাবু নতুন নায়িকাও নিয়ে এসেছেন ডবল টাকা দিয়ে। অতএব, আর ভয় কী? এরই মাঝে কালীকৃষ্ণবাবু বলে গেছেন, আজ লাটসাহেবও আসবেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। লর্ড ডাফরিনের স্ত্রী লেডি ডাফরিন ভারতের মেয়েদের শিক্ষিত করবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চলেছেন, তাঁর কৃপায় মহারাণীও গ্রান্ট পাঠাচ্ছেন প্রসূতিসদন আর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য। তাই, অভিনয়ের মাঝে মহারাণীর মহানুভবতার কথাও যেন প্রচার করা হয়! সেই মতো গান আর সংলাপ তৈরি হয়েছে...

আজকের মঞ্চের চারপাশে তিলধারণের জায়গা নেই। চিকের ওপারেও মেয়েদের ভীড় যেন একটু বেশিই। লাটসাহেব আর তাঁর স্ত্রী অবশ্য একসাথেই বসেছেন, বিলেতের বাবুদের বউরা পর্দানসীন নন, এ বড়ই

বিস্ময়ের ব্যাপার। লেডি বলেছেন, মা দুর্গার মুখটা যেন একেবারে মহারাণীর মতো!

প্রথমে কবিগান, তারপর লক্ষ্ণৌয়ের রোশেনারাবাঈয়ের ঠুমরি-গজল; তারপর গুলশনবাঈয়ের নাচ, আর সব শেষে থিয়েটার। আজ সবাই রাত জাগবে, শেষরাতে সন্ধিপুজো। কালীবাবু ট্যাঁক ঘড়ি বার করে দেখছেন, গিরীশ কি আসবে না? এমন সময় বন্ধুকে আসতে দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটলো, "এত দেরী যে!"

"একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতে চলেছি," গিরীশবাবু বললেন।

"কি? নতুন নাটক?"

"নতুন নয়, তবে এদেশে হয়তো নতুন..."

"কি রকম?" কালীবাবু জানেন গিরীশ ঘোষ মানেই থিয়েটারে চমক...

"ভেবে দেখেছো, আর কতদিন থিয়েটরে এইসব সাংসারিক কূটকাচালি, আর ধর্মকথা শোনাবে? কলকাতার একটা বড় অংশ ইউরোপীয়ন, এঁরা এদেশের ভাষাও বোঝেন, কিন্তু তথাপি বাঙালীর থিয়েটার হলের পথ মাড়ান না। কেন জানো? আমরা ওঁদের উপযোগী

কোনো কিছু এখনও তৈরী করে উঠতে পারিনি।" গিরীশ ঘোষ বললেন।

"ইংরাজী প্লে লিখবে নাকি?"

"নাহ্, ভাবছি শেক্সপীয়রকে বাংলায় মঞ্চস্থ করবো। শিক্ষিত বাঙালীর মন্দ লাগবে না এমনিতেই তো একদল মানুষ থিয়েটারকে যাত্রাপালা বলে, আমরা নাকি বারবণিতাদের মঞ্চে ওঠাচ্ছি..."

"আর কোন মেয়ে অভিনয় করবে? কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে-বৌ কি অ্যাক্টো করবে?" কালীবাবু বললেন, "এই বাড়ীতে থিয়েটরের মেয়েদের আনা নিয়েই কি কম হাঙ্গামা হয়েছে? মুসলমানী নর্তকী ঠিক আছে, কিন্তু রামবাগান আর সোনাগাছির মেয়েরা? মা তো বলেই দিয়েছেন, একাদশীতে বারমহলে গঙ্গাজল আর গোবরগোলা পড়বে। আমার গিন্নী সরযূবালাও মায়ের মতোই সেকেলে, যতই গড়ে নিতে চাই, হয় না।"

গিরীশ ঘোষ হাসলেন, বাঙালী সমাজ এক ভীষণ দোটানার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে ধর্মের নামে দেশাচার, লোকাচার; অন্যদিকে ঔপনিবেশিক প্রভুদের স্বপ্নময় ভোগবাদী দুনিয়া; একদল হিন্দুধর্মের সবকিছুকে নস্যাৎ করতে চায়, অন্যদল খড়কুটোর মত

কুসংস্কারগুলোকেই আঁকড়ে রাখতে চায়। এরই মধ্যে উর্দিপরা বেয়ারা বিলাতী মদ নিয়ে এলো, কালীবাবু হুইস্কির পেগ হাতে নিলেও গিরীশবাবু ফিরিয়ে দিলেন।

"মদ্যপান কি একেবারেই ছেড়ে দিলে?" কালীকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন।

"একবার ঠাকুর আমার পাপ তাঁর দেহে ধারণ করেছেন, আর ওই ছাইপাঁশ গিলি? ধূমপানও ছেড়ে দিয়েছি।" গিরীশবাবু বললেন।

"তবে তো তুমি অমৃতের সন্ধান পেয়েছো!"

"সে আর বলতে..." গিরীশ ঘোষ মঞ্চের দিকে তাকালেন।

অমৃতলাল বসুর লেখা প্রহসন 'বিবাহ বিভ্রাট' চলছে। তাঁরা এতক্ষণ যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন এই নাটকও তারই প্রতিফলন। নাট্যকুশলীরা নিজের সবটুকু উজাড় করে অভিনয় করে চলেছে। তবে বিলাসিনীর অভিনয় বেশ ভালো, নিঁখুত ইংরাজি উচ্চারণ, কী সুন্দর করে 'রুল ব্রিটানিয়া' গানটা গাইলো লেডি ডাফরিন হাততালি দিয়ে বললেন, "আবার গাও।" দ্বিতীয়বার গান শেষে লেডি মেয়েটিকে পুরষ্কার দিলেন। সবাই লেডি ডাফরিনের নামে জয়ধ্বনি দিল। এমনিতেও বাঙালী

যুবসমাজের কাছে লেডি খুবই জনপ্রিয়, তিনি ভারতে এসেই নিজস্ব তহবিল খুলে বাঙলার মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটাতে শুরু করছেন। তিনি একজন বঙ্গললনাকে এমন নিঁখুত অভিনয় করতে দেখে চমকৃত।

"তুমি কী পুনরায় বিনোদিনীকে খুঁজে পেলে?" কালীকৃষ্ণ পেগে চুমুক দিয়ে বললেন।

"এই মেয়েটিও অনেকদূর যাবে, তা ওর নাম কি?"

"তিনকড়িবালা। মহেন্দ্রলাল বসুর আবিষ্কার..."

গিরীশ ঘোষ মেয়েটির অভিনয় দেখতে লাগলেন। বিনোদিনীও তাঁর আবিষ্কার, চৈতন্যলীলার পর বিনোদিনীর থিয়েটারে মোহভঙ্গ হয়, তার জায়গা নেয় কিরণবালা। সেও প্রতিভাময়ী ছিল, কিন্তু মারণব্যধি তাকে বাইশ বছরেই ভবলীলা থেকে মুক্তি দিল। এরপর আরও বহু নায়িকা এসেছে, কেউ সুন্দরী, কেউ সুগায়িকা, কিন্তু অভিনয়ের সময়ে চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাওয়া সবাই পারে না।

"নতুন প্লেতে নায়িকা নেবে ভাবছো? নিতে পারো, শেক্সপীয়রের গল্পে এরকমই চাই! তা কোনটা করছো?"

"ম্যাকবেথ ভাবছি, এই মেয়েটি লেডি ম্যাকবেথ হলে কেমন হয়?"

বন্ধুর কথায় কালীবাবুর বিষম খাওয়ার যোগাড়, শেক্সপীয়রের প্লের মধ্যে ম্যাকবেথ বেশ কঠিন, তায় লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকা! কোনো বাঙালী মেয়ে লেডি ম্যাকবেথ হতে পারবে!

"ওরকম স্বৈরাচারী নারীর ভূমিকায় কোনো বঙ্গললনা! বাংলাদেশের অবলারা এই চরিত্রের গভীরতা অনুভব করতে পারবে!" কালীকৃষ্ণবাবু বললেন।

"যখন চৈতন্যলীলা মঞ্চস্থ করেছিলাম তখনও তো কেউ ভাবিনি যে বিনোদিনী চৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে দর্শকদের কাঁদিয়ে ছাড়বে! ঠাকুরও ভাববিভোর হয়ে গেলেন।" গিরীশ ঘোষ বললেন।

বিনোদিনী অসংখ্য তারার ভীড়ে এক অসামান্য নক্ষত্র ছিল। যে কোনো রোলেই তার ছিল সমান স্বাচ্ছন্দ্য... গিরীশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বিনোদিনীর অভাব বাংলা থিয়েটার কোনোদিনও ভুলবে না, কিন্তু তাঁকে নতুন তারকা খুঁজে নিতেই হবে।

"থিয়েটার শেষ হলে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই," গিরীশবাবু বললেন।

"মেয়েটির তো ভাগ্য বদলে গেল হে," কালীবাবু বললেন।

"সবই ঠাকুরের কৃপা, মায়ের আশীর্ব্বাদ," গিরীশ ঘোষ কপালে হাত ঠেকিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে প্রণাম করলেন। তিনি যখনই কোনো কঠিন কাজে হাত দিয়েছেন, সবসময়ে ঠাকুরকে স্মরণ করেছেন, এবারেও তার অন্যথা হবে না। শ্রীমার আশীর্ব্বাদ নিয়েই তিনি ম্যাকবেথের অনুবাদে হাত দেবেন।

থিয়েটার শেষের মুখে, একশ' আট প্রদীপ জ্বালানো শুরু হয়েছে, পদ্মফুল ফোটানো চলছে, এখনি সন্ধিপুজো শুরু হবে। এই সন্ধিক্ষণেই নাকি শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে মেরেছিলেন, মা দুর্গা মহিষাসুরকে মেরেছিলেন, এ ক্ষণ নাকি নতুনের বার্তা দেয়। গ্রীনরুমে বসে মেকআপ তুলতে তুলতে ভাবছিল তিনকড়ি, ছোটোবেলায় দেখা সেই রাবণবধ পালার কথা। তিনকড়িরও সন্ধিপুজো দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু, ওর বলির দৃশ্য সহ্য হয় না। এ বাড়ীর পুজোয় জোড়া পাঁঠাবলি হবে, দুটো নধরকান্তি কালো ছাগলকে সর্ষের তেল মাখিয়ে কপালে সিঁদুর পরিয়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে। থিয়েটারের মেয়েরা সন্ধিপুজো দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি পোশাক পরিবর্তন করছে।

"কিরে তিনু, যাবি না?" গোলাপীবালা জিজ্ঞেস করলো।

"না গো, বলি দেখলে ভয় করে..."

মেয়েরা হেসে উঠতেই, হঠাৎ গ্রীনরুমের দরজা খুলে একটা ছোটো ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিলে, "তিনুদিদি, তোমায় গিরীশবাবু ডাকছেন... শিগগিরি চলো..."

গিরীশবাবু ডাকছেন? তিনুর বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল, মেয়েদেরও হাসাহাসি বন্ধ। থিয়েটারের মেয়েরা সবসময়েই তাঁর স্নেহধন্যা হতে চায়, তবে কী তিনকড়ির কপাল খুললো!

তিনকড়ি দুরুদুরু বক্ষে গেল বসার ঘরে, সেখানে নীলমাধববাবু এবং আরোও অনেকেই রয়েছেন। ও প্রণাম করতেই গিরীশবাবু বললেন, "থাক মা, থাক, আরও এগিয়ে যাও।"

"ও জোর করেই পার্টটা নিয়েছিল," নীলমাধববাবু জানালেন।

'আমি কি কিছু ভুল করেছি?' তিনকড়ি ভাবলো।

"খুব সুন্দর ইংরাজি উচ্চারণ, তুমি পড়তে জানো?" গিরীশবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে..."

"আচ্ছা, তুমি এই অংশটা পড়ো তো মা... ভাষাটা ইংরাজি হলেও বাংলায় লেখা, আর নীচে তর্জমাটাও..."

তিনকড়ি বইটা হাতে নিলো, ও লেখাপড়া শিখেছে নিজের চেষ্টায়, কিন্তু ভালোই পড়তে জানে, "কাম য়্যু স্পিরিটস দ্যাট টেন্ড অন মর্টাল থটস্, আনসেক্স মি হিয়ার, অ্যাণ্ড ফিল মি ফ্রম দ্য ক্রাউন টু দ্য টপ-ফুল অব ডায়ারেষ্ট ক্রুয়েলটি..."

গিরীশবাবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেন, মণ্ডপ হতে যে মন্ত্রধ্বনি ভেসে আসছে তাকে ছাপিয়ে তিনকড়ির সংলাপ তাঁর কানে আসছে। একটা লাইন পড়েই চরিত্রের গভীরতা মেয়েটি অনুভব করে নিয়েছে। আজ এই সন্ধিক্ষণে তিনি পেয়ে গেছেন নতুন বিনোদিনীকে...

"খুব সুন্দর, একাদশীর পরই রিহার্সালে এসে যেও," গিরীশবাবু বললেন, "এখন যাও, মায়ের পুজো দেখো।"

"একটা কথা বলবো, বাবু?" তিনকড়ি ভয় ভয় জিজ্ঞেস করলো।

"পারিশ্রমিক তো? আমি না হয় পঞ্চাশ টাকাই দেবো..." গিরীশবাবু বললেন।

তিনকড়ি দেখলো নীলমাধববাবুর মুখেও বিরক্তির ছাপ। কীরকম বেয়াদপ মেয়ে! নাট্যগুরুর সঙ্গে দর কষাকষি করছে!

"আজ্ঞে না, বাবু... আমি শুধু... আমি শুধু আপনার জ্যান্ত মা দুর্গাকে দেখতে চাই। আপনি আমায় বাগবাজার নিয়ে যাবেন?" তিনকড়ির কথায় চমকে উঠলেন গিরীশবাবু, "আপনার দুর্গা কি আমার মতো মেয়েকে দেখা দেবেন?"

"মা সবার মা, পাতানো মা নন, গুরুপত্নীও নন, নিজের মা। আজ সন্ধিক্ষণে তুমি জগদম্বার সাক্ষাৎ চেয়েছো, তাই হবে। কাল দশমীতে মৃন্ময়ী মূর্তির বিসর্জন হলে আমরা চিন্ময়ী মায়ের আশিস নিতে যাবো," গিরীশবাবু বললেন।

তিনকড়ি মণ্ডপে এলো, বাগবাজারের মাকে সে কখনো দেখেনি, তবে মনে হলো আজ সন্ধিক্ষণে সে স্বয়ং দেবী দুর্গারই আশীর্ব্বাদ পেয়ে গেছে!

(তথ্যসূত্র: তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ১৯১৯, রমা প্রকাশনি, কলকাতা বইটি থেকে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সংগৃহিত হয়ছে) ■

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: এপ্রিল ২০২৪ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই মার্চ, ২০২৪

স্রোত

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

বয়ে চলে স্রোত গতানুগতিক পথ ধরে
নির্জন দ্বীপে দ্বীপে ফাঁকা হুংকারের সুরে।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকা রাশিকে করে গ্রাস
মেটায় মনের সুপ্ত ক্ষোভের ভেজাল আশ্বাস।

দিনের সোনালী ঝকমকে কণার জৌলুসের মায়া
মিছা মোহ জ্বালে আচ্ছন্ন হয় বোধহীন যত কায়া।
অজস্র কাঁটা তারে গড়ে মহীরূহ, বালুকা বেলায়
সারি সারি ইমারতের স্তূপে, সুখ খোঁজে হেলায়।

কাজল কালো আঁধার নামে দিনের খেলা শেষে
আঁকিবুঁকি বালির আঁচড় হারায় যেন এক নিমিষে।
জাহাজের মাস্তুল যেইভাবে মিলায় যায় স্রোতের বিপরীতে
স্বপ্নের অট্টালিকাও সেইভাবে আছড়ে পড়ে বিবাগী স্রোতে।■

দৃষ্টান্ত

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

সেই কোন যুগে পশ্চিমবঙ্গের পাঠ চুকিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে দেশান্তরি হয়েছি, তা ভাবতে গেলে দেখি – জীবনের দুই-তৃতীয়াংশই কেটে গেল বাংলার বাইরে। ভিডিও কলিং-এর দৌলতে যদিও বাড়ির লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক আজও অটুট, স্কুল বা কলেজ-এর বেশিরভাগ বন্ধুদের সঙ্গেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অনেকদিন। স্মৃতির কোঠা থেকে হারিয়ে গেছে অনেকেরই মুখশ্রী। যাদের সাথে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাদের কেউ কেউ এই দুনিয়া থেকে পাড়ি দিয়েছে অন্য কোথাও... আর কারও কারও চেহারা এত বদলেছে যে – আলেকালে যখন পশ্চিমবঙ্গের বাড়িতে বেড়াতে যাই, তারা পাশ দিয়ে চলে গেলেও, যতক্ষণ না কেউ পরিচয় করিয়ে দেয়, তাদের চেনবার জো নেই।

এ হেন অবস্থায় হঠাৎ যদি কোন এক অবাঙালি মানুষ, এই বিদেশে ফোন করে, স্পষ্ট বাংলায় বলেন যে তিনি আমার ছোট বেলার বন্ধু – তবে কেমন লাগে ভাবুন তো...

বিস্ময়ের বাঁধ একেবারে ভেঙে যায়, তাই না? হ্যাঁ, এমনই হয়েছিল সেদিন। 'অফিস' থেকে ঘরে ফিরে, সবে টেবিলের ওপর মোবাইল আর পার্সটা রেখেছি, মোবাইলটা হঠাৎ ঘ্যানঘ্যান করে উঠল, আমার বস্ মাঝেমধ্যেই অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর ফোন করেন, তাই একটু উদ্বিগ্নতার সাথেই ফোনটা তুলে দেখি এক অচেনা নাম্বার...

– হ্যালো, হু ইজ অনলাইন?

অপর দিক থেকে উত্তর এলো, "আমি তোর ছোটবেলার বন্ধু দিলীপ সিং বলছি। কেমন আছিস?"

– দিলীপ সিং! আপনি কাকে চান? ওয়েল, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ ডায়েল্ড অ্যা রং নাম্বার।
– তুই অভ্র সেন বলছিস তো?
– হ্যাঁ, আমি অভ্র, কিন্তু, দিলীপ সিং... ছোট বেলার বন্ধু... আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু ভেঙে বলুন তো...
– হ্যাঁ, না মনে থাকারই কথা। একজন রাস্তার বন্ধুকে কে আর মনে রাখে? আবার যদি সে চালচুলহীন এক খোয়া ভেঙে বেড়ানো পরিবারের ছেলে হয়...
– দেখুন, আপনি কি সব বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আমি কিন্তু মানুষকে মানুষই ভাবি।

প্রত্যেক কাজই তো কাজ, সমাজের জন্য সব কাজেরই প্রয়োজন আছে। যে কাজ করে সে আবার তাচ্ছিল্যের পাত্র কি করে হয়! আমার অন্তত একজন বন্ধুকে এই মুহূর্তে মনে করতে পারি, যার পরিবার জমাদারের কাজ করত। কিন্তু নিজের চেষ্টায় সে আজ আমার অফিসের কলিগ এবং একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনি কি সব যে বলছেন, আমি...

– থাক, আর লেকচার দিতে হবেনা। একটু ভেবে দেখতো, ক্লাস সেভেনে ফিরে যা...

– দেখুন, আমি পাড়ার বাংলা স্কুলে পড়েছি। আর শুধু ক্লাস সেভেনে কেন, পুরো স্কুল-জীবনে, আমার ক্লাসে কখনোই কোন অবাঙালি ছেলে ছিলোনা। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেটা।

– আমি কি বলেছি যে আমি তোর স্কুলে, তোর ক্লাসে পড়তাম?

– না, মানে... আপনি ওই ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়ের কথা মনে করতে বললেন কিনা, তাই...

– শোন্, আমি কিছুদিন আগে একটা কাজে, হঠাৎ কলকাতায় গিয়েছিলাম। তখন একদিন হাওড়ায়, তোকে খুঁজতে তোদের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। তোর

ভাই আমাকে চিনতে পেরেছিল। আর তা ছাড়া, তোদের পাড়াতেই তো আমারও ছোটবেলার অনেকগুলো বছর কেটেছে, তাই দু'একটা বন্ধুর সাথেতো আজও যোগাযোগ রয়েছে, ভলিবল মাঠের ধারে পুততুণ্ড গিন্নীর বাড়িতে আমরা অনেক বছর ভাড়া ছিলাম। ওখানকার সমীর দাসকে মনে করতে পারিস? ওই আমাকে নিয়ে তোদের বাড়িতে গিয়েছিল।

– দেখুন আমার ভাইতো তেমন কিছু আমায় বলেনি...

– তোর ভাই ব্যস্ত মানুষ, সারাদিন ব্যবসা নিয়েই হিমসিম খায়, হয়ত ভুলে গেছে... এনি ওয়ে, এতদিন পরে তুই আমাকে যে ফট্ করে মনে করতে পারবিনা, সেটা আমার কাছে একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। তুই একবার তোর ভাইকে ফোন করে জেনেনে, আমি লোকটা ঠগ-জোচ্চোর কিনা, রাতে আমি সাড়ে ন'টার পর তোকে আবার ফোন করব। তোকে কিছু কথা আমায় এ জীবনে বলে যেতেই হবে, না হলে যে আমার মরেও শান্তি হবেনা রে... এখন রাখছি।

দিলীপ সিং লাইনটা কেটে দেবার পর ফোনটা আবার টেবিলে রেখে, পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম। অনেক

চেষ্টা করেও, কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, কে এই দিলীপ সিং! যদি সে আমার ছোটবেলার পরিচিত কেউ হয়েও থাকে, এতদিন পরে আমার সাথে তার কি এমন জরুরি কথা থাকতে পারে – যেটা না বলতে পারলে সে মরেও শান্তি পাবেনা! সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল... টেবিল-এর ওপরে কনুই দুট রেখে, দুই হাতের চেটোর মধ্যে মাথাটা গুঁজে স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘোর কাটল রমার ডাকে, “এই নাও কফি।”

আচমকা উঠে, কফিটা নিতে গিয়ে, দিলাম ওর হাতেই এক ঝটকা। “উঃ” চীৎকার করে রমা দু’পা পিছিয়ে গেল। ভাগ্যিস, পুরো গরম কফির কাপটাই উল্টে যায়নি! একটু আশ্চর্য হয়ে রমা জিজ্ঞাসা করল, “কি হয়েছে গো? তোমার শরীর ঠিক আছে তো? কার ফোন? কি বলল?” এক নিশ্বাসে ও প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দিল। আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই, ও আবার বলল, “রোজতো অফিস থেকে এসেই ড্রেস চেঞ্জ করে তুমি ওয়াশ রুমে ঢুকে যাও, আজ এভাবে বসে পড়লে কেন? কি হয়েছে গো?”

রমাকে শান্ত করে বললাম, “কিছু হয়নি, একজন অবাঙালি

লোক আমার বাল্যবন্ধু পরিচয় দিয়ে ফোন করেছিলেন। আমাকে নাকি তাঁর কিছু বিশেষ কথা বলার আছে... ভাইয়ের কাছ থেকে আমার নাম্বার-টা পেয়েছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা গো...”

– তা এতে এত ভাববার কি আছে? ঠাকুরপোকে ফোন করে জেনে নিলেই তো হয়, ও কারুকে তোমার ‘নাম্বার’ দিয়েছে কিনা...

মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে ভাবলাম, সত্যিই তো, আমি কি বোকা! ভাইকে একটা ফোন না করে, তখন থেকে আমি অতীতের আকাশ-পাতাল তন্নতন্ন করে খুঁজে যাচ্ছি! কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে ভাইকে ডায়াল করতে লাগলাম।

ভাই কল রিসীভ করে বলল, “দাদা তোকে আমি পাঁচ দশ মিনিট পরেই ফোন করছি।” অগত্যা, অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। কফি খেতে খেতে, মনে মনে আবার অতীতের স্মৃতিগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। কত ভুলে যাওয়া মানুষ ধেয়ে এলো স্মৃতির সরণি ধরে... কিন্তু না, দিলীপ সিং-এর তো হদিস মিলল না।

প্রায় দশ মিনিট পরে ভাইয়ের কল এলো। কথা বলে যা

জানলাম তার সারমর্ম এই যে – ভাই কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিল আমাকে জানাতে যে – বেশ কিছুদিন আগে, পাড়ার সমীর দাসকে নিয়ে দিলীপ সিং নামে এক অবাঙালি ভদ্রলোক আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। সব পরিচয় দিতে, ও ভাল করেই লোকটিকে চিনতে পেরেছে, এবং আমার ফোন নাম্বারও দিয়েছে।

বছর চল্লিশ আগে, প্রায় আমাদেরই সমবয়সী, দিলীপ সিংরা সত্যিই আমাদের পাড়ার পুততুণ্ড গিন্নীর বাড়িতে ভাড়া থাকতো। তখন আমাদের পাড়ায় অনেক খালি জমি। বেশ কিছু বাড়িও তৈরি হচ্ছে। দিলীপদের পরিবার বিহার থেকে এসেছিল ওখানে কিছু কাজ পাবার আশায়। ছোট্ট দিলীপের মা-বাবা-কাকা-কাকী সবাই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খোয়া ভাঙতে চলে যেত বিভিন্ন কন্সট্রাকশন সাইটে। সে আর একা কতক্ষণ ঘরে থাকবে? বেরিয়ে পড়ত পাড়া চড়তে। এইভাবে তখনকার স্কুল-পড়ুয়া পাড়ার অনেক ছেলের সাথেই তার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। এখন বড় এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে দিলীপরা পাটনায় থাকেন।

আমার ভাইকে উনি জানিয়েছিলেন, সেইসব বন্ধুদের মধ্যে আমি নাকি একজন বিশিষ্ট বন্ধু, কারণ আমি নাকি

ওঁকে জীবনে দাঁড়াতে খুব সাহায্য করেছি। ভাইয়ের মুখে কথাটা শুনে, আমিতো আকাশ থেকে পড়লাম। যাঁর কথা মনেই পড়েনা, সেই লোক বলে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি তাঁকে জীবনে দাঁড়াতে সাহায্য করেছি... হাউ স্ট্রেঞ্জ! যা হোক, দুশ্চিন্তার অধ্যায় পেরিয়ে গিয়ে, এবার শুরু হল আমার সাস্পেন্সের পালা। কিন্তু তা তো রাত সাড়ে ন'টার পরেই কাটবে। অগত্যা, উঠে ওয়াশ রুমের দিকে যেতে যেতে রমাকে বললাম, "আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বসব, এই দিলীপ সিংএর কথা শুনতে। তুমি সব রেডি করে ফেলো।"

সাড়ে ন'টার একটু পরেই দিলীপ সিংএর ফোন এলো। প্রথমেই তিনি জানতে চাইলেন, আমি ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি কিনা। আমি বললাম, "হ্যাঁ, ভাই সব জানিয়েছে।"

- ভাইরে, তোর বয়সটাই বাড়লো শুধু, তুই আর শুধরালি না।
- মানে?
- ঐ ছোট বেলায় যেমন ভয় পেতিস, আজও তেমন।
- মানে, আমি কিসে, কার থেকে আবার ভয় পেলাম?
- এই যে, একটা অচেনা লোকের ফোন-কল পেয়েই তোর জান বেরিয়ে গেলো।

– দূর, কিছুই হয়নি আমার। আমি শুধু আপনাকে ঠিক রেকগনাইজ করতে পারছিলাম না। তাই... তা আপনি কি যেন বলতে চাইছিলেন?

– হ্যাঁ, আমিতো এই দুনিয়ায় আর কিছু দিনেরই মেহমান, তাই যাবার আগে সবার সাথে কথা বলে বা দেখা করে, এ জীবনের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। আমি এখন ক্যানসারের ফোরথ স্টেজ-এ আছি। পাটনায় তো ভাল চিকিৎসা হয়না, তাই কলকাতায় গিয়েছিলাম চিকিৎসার জন্য। কিন্তু ওখানেও জানিয়ে দিল যে আর কিছুই হবে না। তাই সব বন্ধুদের সাথে শেষ বারের মতো দেখা করতে হাওড়ায় গিয়েছিলাম। তখনই জানলাম তুই মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়ে গেছিস। এখন শেষ চিকিৎসার আশা নিয়ে মুম্বাই এসেছি। দেখি কি বলে, এখানকার ডাক্তাররা...

– আই ট্রুলি ফীল স্যরি টু নোট ইট।

স্পষ্ট ইংরাজীতে উত্তর এলো, "আই এম অলসো স্যরি টু লেট ইউ নো এবাউট মাই টারমিনাল ইলনেস।" এখন এই লোকটির ইংরাজী বলার স্টাইল শুনে মনে হচ্ছিল – লোকটি বেশ শিক্ষিত। কিন্তু তা কি করে হতে পারে? দিলীপ সিং তো

নিজেকে খোয়া ভেঙে বেড়ান পরিবারের ছেলে বলে জানালেন সন্ধ্যাবেলায়, আর আমার ভাইও তো সেটাই কনফার্ম করলো। কিছুই যে মিলছে না। আমার বিস্ময়ের পারদ চড়তে লাগলো... কিছুক্ষণ নীরব থেকে, দিলীপই আবার কথা বলা শুরু করলেন, “কি ভাবছিস?”

- দেখ বন্ধু, মনে করার চেষ্টা কর, তুই যখন সেভেনে পড়তিস, দুপুর বেলা স্কুল থেকে ফেরার পথে একটা ছেলে তোর সাথে প্রায়ই লেভেল-ক্রসিং-এর ধারে কথা বলত। তারপর একটু আলাপ জমলে, তোর স্কুল-ব্যাগ খুলে বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখত। পরে মাঝেমাঝে তোর থেকে দু’একটা বই ধারও নিত... তুই খুব ভয় পেতিস বইগুলো দিতে, বারবার বলতিস ঠিক ফেরত দিবি তো কাল? মনে পড়ছে কি? কখনও কখনও তোকে দু’তিনটে অঙ্কও দেখিয়ে দিতে বলত... মনে আসছে কি?

সহসা একটা ভাসাভাসা চেহারা যেন আমার মনের গভীর অন্তঃপুর থেকে উঁকি দিতে লাগল। এক অজানা আবেগে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, “দিলে?”

- হ্যাঁ রে ব্যাটা, এবার ঠিক চিনেছিস।

– তোরা তো পুততুণ্ড গিন্নীর বাড়ি ছেড়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলি, তাই না?

– হ্যাঁ, ওখানে ভীষণ অসুবিধা হতো। তা ছাড়া কলকাতার দিকে বাবা-কাকারা কাজের জন্য ভাল টাকাও পেতে শুরু করেছিলেন। তখন আমরা যাদবপুরের দিকে চলে যাই। ঐখানেই আমি একটা নাইট স্কুলে ভর্তি হই। হাওড়ায়তো সেসব সুযোগ ছিলনা... তারপর স্কুল শেষ করে ইভিনিং ক্লাসে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করি। খুব মজা হতো তখন জানিস – আমি বড় বড় শীট পেপারে বিভিন্ন রকম কন্সট্রাকশনের ডিসাইন বানাতাম, আর বাড়ির সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো।

সকালে একটা দোকানে কাজ করতাম তখন। তারপর পাটনায় একটা প্রাইভেট কোম্পানি-তে চাকরি নিয়ে চলে যাই। সেখান থেকে আমি একটা সরকারি পরীক্ষা দিয়ে তখনকার বিহার সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে একটা চাকরি পাই। ততদিনে আমি গ্র্যাজুয়েটও হয়ে গেছি। আজ আমি ঐ ডিপার্টমেন্টেরই চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

– ও, ইটস রিএলি অ্যা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট...

– কিন্তু ভগবান বোধহয় এতটা চাননি রে। তাই এই অকালেই আমাকে ফিরিয়ে নিতে চান।

– মন ছোট করতে নেই ভাই। কিছু একটা মিরাকেল নিশ্চয় হবে। হ্যাঁ হবেই, তোর অনেক কাজ এখনও বাকী আছে। নাহলে এতটা পথ তোকে চলালেন কেন তিনি?

– কি হবে জানিনা ভাই, যা আমার হাতে নয়, তা নিয়ে আর ভাবিওনা। তাই জীবনে যার কাছে যতটুকু পেয়েছি, শুধু তাকে তার জন্য কৃতজ্ঞতাটা জানিয়ে যেতে চাই। তোর বইগুলো পড়েছিলাম বলেইতো, নাইট স্কুল-এ আমি সেভেন-এর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে সোজা এইট-এ পড়ার চান্স পাই।

– দূর, কি যে বলছিস! তেমন কিছুই না। সবই তোর চেষ্টার ফল আর ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। ক'জনের এমন সৌভাগ্য হয় বলতো?

– ঠাকুরের আশীর্বাদ তো বটেই। কলকাতায় থাকতে আমি প্রায়ই বেলুড় মঠে যেতাম। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ পেলে জীবনে জীবনে সবই হয়। এখন বল কবে দেখা করবি? আমার খুব ইচ্ছা তোকে নিয়ে কোন হোটেলে একসাথে ডিনার করি। কাল আর পরশু আমি ফ্রী আছি, তারপর তো ডাক্তারদের ব্যাপার। আসতে

পারবি ভাই? আমি নিউ বেঙ্গল লজে উঠেছি, একদম মুম্বাই সি. এস. টি.-র পাশেই।

দিলীপের কথাগুলো কানে আসলেও, আমি তখন ওর এক্সেমপ্লারি অ্যাচিভমেন্ট আর এক্সট্রীম মিসফরচুনের কথা ভাবতে ভাবতে কোন্ অন্ধকারের তলে তলিয়ে গেছি তা নিজেই জানিনা। এবার ও যেন একটু রাগত স্বরে বলে উঠল, “আরে কবে আসছিস বলবিতো?”

ফোরথ স্টেজে পৌঁছলে ক্যানসার যে সারেনা, তা আমি ভাল করেই জানি। স্বয়ং ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবই তো ঐ রোগে স্বর্গারোহণ করেছিলেন... তাঁর কাছে কি আর আমি দিলীপকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা প্রকট করতে পারি! তাই আমি কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, “কালই আসবো রে দিলীপ। তোকে একবার স্বচক্ষে দেখার সুযোগ কি ছাড়তে পারি? তুই তো সাধারণ মানুষ না, তুই যে একটা জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত...” ■